Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 174-191

আবু ইসহাকের ছোটোগল্প : করাচিতে বাঙালির সংগ্রাম

অর্পিতা মাসান্ত

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে লড়াই পূর্ব বাংলার বাঙালিরা শুরু করেছিলেন তা শেষ হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে। এই সুদীর্ঘ সময়টিতে বাঙালিকে সহ্য করতে হয়েছে অকথ্য অত্যাচার। ভাষা আন্দোলনের (১৯৫২) মাধ্যমে যে প্রতিবাদের সূচনা হয়েছিল ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯)-এর মধ্য দিয়ে তা মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) রূপ নিল। মুক্তিযুদ্ধে গিয়েই বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান যেন সমাপ্ত হল। মুক্তিযুদ্ধের ফলেই বাঙালি পেল স্বাধীন, গণতান্ত্রিক একটি দেশ— বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশের লেখকদের কাছে এই সময় পর্বটি (১৯৪৭-১৯৭১) কোনোও বিবর্ণ ইতিহাস নয়, একটি সূক্ষ্ম আবেগ। তাঁদের লেখালিখিতে বারবার স্থান করে নিয়েছে এই সময়পর্বের বাংলাদেশ। তবে এই সময় পর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মসূত্রে যেসব বাঙালিরা ছিলেন তাদেরকে কী ধরনের অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল সেই বিষয়টি কিন্তু ইতিহাসে বা সাহিত্যে খুব একটা সহজলভ্য নয়। যেহেতু প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-ভূমি ছিল বাংলাদেশ তাই পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের দুরবস্থার অভিজ্ঞতা ইতিহাসে ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই অনেকখানি অনালোকিত। আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) এই দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন কারণ এই সময়-পর্বটিতে বেশ কিছু বছর (১৯৫৬-১৯৭৩) তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও ১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানে সপরিবারে অবরুদ্ধ অবস্থায় দিন কাটান। আমরা বুঝতেই পারছি যাদের বিরুদ্ধে বাঙালির লড়াই সেই পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে যখন বাঙালিরা আটকে পড়েছিলেন তখন তাদের কী দুর্বিষহ অবস্থা হতে পারে। সেই সময় যারাই সেখানে আটকে পড়েছিলেন তাদেরই এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সংকটের আগে থেকেই কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাকালীন বাঙালিদের উপর চলত নানা ধরনের নিগ্রহ। বাঙালির মুল্লুকে গিয়ে যারা বাঙালিদের উপর শাসন-শোষণ চালায় তারা পাকিস্তানবাসী বাঙালিদের কী নজরে দেখবেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ গড়ে ওঠার মধ্যে যে রক্তঝরা সংগ্রাম

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ছিল তা সেই সময়কার প্রত্যেকটি লেখকের লেখায় উঠে এসেছে বিভিন্নভাবে। তাঁরা ছিলেন বধ্যভূমিতে। তাঁদের বেশিরভাগেরই এ সম্পর্কে ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তবে সেই সময় করাচিবাসী বাঙালির কী দুরবস্থা হয়েছিল, তাদের সংগ্রাম কতটা কঠিন ছিল, তাদের নিত্যদিনের বেঁচে থাকা কতটা দুর্বিষহ ছিল যাদের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরাই পারবেন সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতে। আবু ইসহাক তাঁদেরই একজন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রসদ সংগ্রহ করেই তিনি 'পিপাসা' (১৯৫৭), 'আলামত' (১৯৮৯), 'ঊনমূল্যায়ন' (১৯৯৭), 'গাড়ল' ইত্যাদি গল্প এবং 'মরণজয়ী এক সংগ্রাম', 'উদ্বেগ-উত্তেজনাময় সেই দিনগুলি' (১৯৭৮), 'দেওয়ালহীন কারাগারের সেই দিনগুলি' (১৯৯৮) নামক বেশ কিছু স্মৃতিচারণমূলক রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। এভাবেই তিনি একটি অনালোকিত অধ্যায়কে, অবহেলিত একটি ইতিহাসকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন— যা পাঠকের কাছে বাড়তি প্রাপ্তি। 'আবু ইসহাকের ছোটোগল্প: করাচিতে বাঙালির সংগ্রাম' নামক গবেষণা নিবন্ধে আমরা এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব।

দুই.

১৯৪৭ সালে ভারত নামক একটি রাষ্ট্রের প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার ভূখণ্ডকে মাঝে রেখে তার পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দুটি ভূখণ্ডকে নিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল একটি আলাদা রাষ্ট্র, যার নাম পাকিস্তান। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের ভূখণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম দিকের নাম পশ্চিম পাকিস্তান। দুটি ভূখণ্ডের মধ্যে যেমন বিস্তৃত ভৌগলিক দূরত্ব ছিল তেমনই শুধুমাত্র ধর্ম ছাড়া ভাষা-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-অনুষ্ঠান সবকিছুর মধ্যেই ছিল বিস্তর বৈপরীত্য। স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালিদের ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আধিপত্যের সুরটি ছিল বেশ স্পষ্ট। কারণ ধর্ম কখনও মানুষকে মেলায় না, মেলায় ভাষা ও সংস্কৃতি। এই গোড়ায় গলদের মাশুল আজও গুনতে হচ্ছে পাকিস্তানে আটক প্রায় কুড়ি লক্ষ বাঙালিকে। এঁদের মধ্যে কিছু রাজাকারও রয়েছেন, যারা মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমর্থন ও সাহায্য করেছেন এবং সেই আনুগত্যের প্রসাদ পেতে মুক্তিযুদ্ধের পরে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ১৯৭১ থেকে ২০২২ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে পাকিস্তানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে নর্দমার কীটের মত জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁদের ভোট দেওয়ার ও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থাকলেও উচ্চশিক্ষা ও সরকারী চাকরির কোনো

সুযোগ নেই, জমি-বাড়ি কেনার অধিকার নেই। থাকতে হয় তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করা সুযোগ-সুবিধাহীন দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর, ঘিঞ্জি বস্তিতে, পেশা হিসাবে বেছে নিতে হয় মাঝি বা জমাদারের কাজ, নিজেদের মহল্লা বা বস্তি থেকে বাইরে বেরানোর কোনো অধিকার নেই, তাঁদের বাড়ির মেয়েদের হতে হয় যৌন হেনস্থার শিকার। কিন্তু প্রায় দু'প্রজন্ম ধরে তাঁরা পাকিস্তানের বাসিন্দা, তাঁদের জন্ম পাকিস্তানে, তাঁদের মুখের ভাষা উর্দু, তাঁরা মনে-প্রাণে নিজেদের পাকিস্তানিই ভাবেন। কিন্তু এখনও তাঁদেরকে 'বিশ্বাসঘাতক বাঙালি' বলে বঞ্চনা করা হয়।[১]

আসলে এঁদের এই বঞ্চনার বীজ নিহিত রয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি পাকিস্তানের মধ্যেই। দু'হাজার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির একটি ভূখণ্ডকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা নিজেদের উপনিবেশ ছাড়া কিছু ভাবতে পারেননি। প্রায় এমনই একটি বক্তব্য উঠে আসে সমালোচক আহমদ শরীফ-এর ভাষা প্রসঙ্গে বিতর্কের অন্তরালে নামক প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন—

> গোড়া থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা অবচেতনভাবেই উপলব্ধি করেছিল পূর্ব-বাংলা হবে তাদের খাজনা উসুলের জমিদারি এবং শুল্ক আদায়ের বন্দর—একটি অনায়াসলব্ধ উপনিবেশ।[২]

সাম্রাজ্যবাদী যেকোন দেশ যেমন সর্বশক্তি নিয়ে প্রথমেই দুর্বল উপনিবেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানও এক দিকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সংস্কৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করে অন্যদিকে সমস্ত রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ও চাকরিবাকরি থেকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সেই বিস্তারিত তথ্যে আমরা যাব না। কারণ ইতিহাস ঘাটলেই এই সংক্রান্ত নানা তথ্য পাওয়া যায়। তবে আমরা এখানে একটি স্বীকারোক্তি উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। কারণ নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তিটি খোদ পাকিস্তানের এক সাংবাদিক বাবর আয়াজের। সাহসী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ফ্রিল্যান্স পাকিস্তানি এই সাংবাদিক লিখেছেন—

> প্রতিবছর ডিসেম্বর এলেই আমরা পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। এই আলোচনার সিংহভাগজুড়েই থাকে ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে হঠকারীভাবে শুরু হওয়া সামরিক অভিযানের বিষয়টি। নিঃসন্দেহে সেই অভিযান ছিল তখনকার ক্ষমতাকাঠামোর খুবই মারাত্মক একটি ভুল।
>
> কিন্তু আজকের বাংলাদেশ সেই গুরুত্বপূর্ণ নয় মাসের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। এটা আসলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি ও সামরিক বাহিনীর ক্রমপুঞ্জিভূত অন্যায়ের ফলাফল হিসেবে ঘটেছিল, যারা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে

উপনিবেশের মতো ব্যবহার করতে চেয়েছিল।... জেনারেল (অব.) টিক্কা খান যখন পিপিপির সম্পাদক ছিলেন, তখন আমি তাঁর সাথে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম... পূর্ব পাকিস্তানিদের সাথে আমরা যে অন্যায় করেছি, তার জন্য কি আমরা ক্ষমা চাইব, নাকি এই মিথ্যা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেই বাঁচব যে সেটা ভারতীয় ষড়যন্ত্র ছিল?[৩]

এই প্রশ্নের সদুত্তর হয়ত আমরা টিক্কা খানের থেকে পাইনি কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছি পাকিস্তানের এক নাগরিকই যখন এমন অনুশোচনায় ভুগছেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার কতখানি নৃশংস ও নির্জলা ছিল। এই বক্তব্যের কাছে ইতিহাসের যেকোনো তথ্যই ম্লান হয়ে যায়। তবে বেশিরভাগ তথ্যেই দেখা যায় বাংলাদেশে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের অত্যাচারের স্বরূপ কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাঙালিদের দুরবস্থার চিত্রটি খুব একটা সহজ লভ্য নয়। এ বিষয়ে সেরকম কোনো গবেষণামূলক তথ্যও আমাদের হাতে নেই। তবে সেই সময় যারা পাকিস্তানে বসবাস করতেন সেইসব বাঙালিদের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের অত্যাচারের নানা দিক ও এর বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্বরূপটি কেমন ছিল।

নব্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী ছিল করাচি। স্বাভাবিকভাবে রাজধানী শহর করাচিতে সেই সময় নানা শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। রাজধানী শহরের সুযোগ-সুবিধা ভোগের আশায়, কখনো বা চাকরি ও পড়াশোনার সূত্রে সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ধীরে ধীরে ভিড় জমাতে শুরু করেন করাচিতে। তবে সেখানে পৌঁছানোর পরেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন কোন চক্রব্যূহের মধ্যে তারা আটকে পড়েছেন। সরকারি-বেসরকারি চাকরি থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ, বাসস্থান সর্বত্রই তাদের পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। বাঙালি হওয়ার অপরাধে রাস্তা-ঘাটে যাওয়া আসার পথে তাদের সহ্য করতে হত নানা টোন-টিটকারি। এটাও যে কতখানি রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ছিল সে বিষয়টি তুলে ধরে সেই সময়ের এক করাচিবাসী বাঙালি মোঃ শরীফুল হক লিখেছেন—

পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও দমননীতি এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার নীলনকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে ছিলেন অতি তৎপর। ফলে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের

সাধারণ মানুষের মনে পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পর্কে একটি বৈরীভাব ও অবজ্ঞার চোখে দেখার মানসিকতা তৈরিতে ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের
মানুষকে তারা মছলিখোর, চাউলখোর, বেখোরদার, বেইমান, হিন্দু ঘেঁষা ও মুসলিম কৃষ্টি বর্জিত হিন্দু প্রভাবিত বলেই জানত।[৪]

আবু ইসহাকের স্মৃতিচারণাতেও উঠে এসেছে এরকমই বিদ্বেষ-বৈরিতার ঘটনা। সেখানে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানি প্রতিবেশীদের দ্বারা ক্রমাগত অত্যাচারিত হতে হতে একটি পরিবার তাঁর দ্বারস্থ হয় এবং অসহায় ভাবে জানায়—

পশ্চিমাদের অত্যাচারে আর করাচিতে থাকা যাবে না। আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে এক পাঞ্জাবী পরিবার। আমার ফ্ল্যাটের দরজার কাছে প্রায়ই ইচ্ছে করে তারা ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখে। আজ প্রতিবাদ করায় তারা আমাকে মারধর করেছে।[৫]

এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে বাঙালিদের নানাভাবে অপদস্ত করা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাত্যহিক কর্মের মত। প্রশাসনিক স্তরে বঞ্চনার আগেও বাঙালিদের কীভাবে প্রাত্যহিক জীবনে বঞ্চনার শিকার হতে হত এখানে সেই দিকটি উঠে এসেছে। আসলে পাকিস্তানের শাসননীতি প্রথম থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছিল যা সাধারণ মানুষের আচরণে প্রতিনিয়ত এভাবেই প্রতিফলিত হত। তবে এই ঘৃণা-বিদ্বেষ-বৈরিতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। অচিরেই তা বৃহত্তর রাজনৈতিক আধিপত্যের ও ষড়যন্ত্রের রূপ নিয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রের প্রথম ধাপ ছিল বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ। আমরা জানি পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান বাঙালিদের 'বাঙালি' হিসেবে আত্মপরিচয় গড়ে তোলার যাত্রা শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। বরকত, সালাম, রফিক জব্বার সহ বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৫৬-তে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে। তারপরও সুদীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিদের যে বাংলা ভাষার অধিকারের জন্য লড়াই করে যেতে হয়েছিল সেই ইতিহাস আমাদের অনেকেরই অজানা। করাচি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বাংলাদেশ)-এর সাধারণ সম্পাদক ডক্টর মোহাম্মদ শরীফুল হকের স্মৃতিকথায় সেই লড়াইয়ের ইতিহাস উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন—

মাধ্যমিক শ্রেণিসমূহের জন্য কোনো বাংলা স্কুল না থাকায় জেকব লাইনসে ছেলেদের একটি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে বাঙালি ছেলেদের জন্য বাংলা শাখা ও বন্দর রোডের ওপরে মেয়েদের

একটি উর্দু মিডিয়াম স্কুলে বাঙালি মেয়েদের জন্য বাংলা শাখা খোলা হয়।... নাম মাত্র বাংলা মাধ্যম চালু করে বাঙালিদের মুখ বন্ধ করা এবং একটা জোড়াতালি গোছের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বাঙালি কিশোরদের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত রাখাই ছিল এই চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য।... উর্দু মিডিয়াম স্কুলে বাঙালি ছাত্র ছাত্রীরা নানাভাবে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হতো। বাঙালি ছাত্র ছাত্রীরা এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করলে উল্টো তাদেরই দুর্ভোগের শিকার হতে হতো।[৬]

আমরা এখানে দেখলাম 'বাংলা' রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তানে স্বীকৃতি লাভের পরও পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রদের দুরবস্থার বিষয়টি এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান যে প্রায় এক দশক পরেও হয়নি তার প্রমাণ ১৯৬৫, ১ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ। সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল—

বর্তমান শাসনতন্ত্রে রয়েছে, উর্দুর সাথে সাথে বাংলাকেও সমমর্যাদা দেওয়া হবে। আমরা কয়েক বৎসর যাবত পশ্চিম পাকিস্তানে তথা করাচীতেও প্রত্যক্ষ করে আসছি তার বিপরীত—এদেশে বাংলা ভাষার কোন স্থান ও মর্যাদা নেই। সরকার কর্তৃক পরিচালিত করাচীর বাংলা স্কুলে উর্দুকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হিসাবে পড়ানো হয়, আফসোসের বিষয়, এখানকার অন্য উর্দু স্কুলগুলিতে বাংলার কোন স্থানই নেই।... করাচি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনেকবার ধর্না দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাকে এখানে শিক্ষার মাধ্যম করার কোন পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নাই।[৭]

বাস্তবিকই করাচি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। মোহাম্মদ নূরুন নবী এফ সি এ তাঁর একটি স্মৃতিচারণায় করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ভাষা আধিপত্যের ভয়ংকর স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে একটি নমুনা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

৩৯ জন বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী বাংলা-মাধ্যমে ১৯৬৯ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের ফলাফল স্থগিত করেন।
শুরু হয়ে যায় উভয় পাকিস্তানের দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রবল প্রতিবাদের মুখে এবং শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর হস্তক্ষেপে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা-মাধ্যমে ৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করতে বাধ্য হয় এবং বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে।[৮]

আসলে আইনি স্বীকৃতির খুশির ডামাডোলে অনেক সময় আড়ালে চলে যায় অনেক বাস্তব। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাই বাংলা ভাষা আইনি স্বীকৃতি লাভের পরও যে পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি, তাঁদের যে সেখানে

ভাষার জন্য নতুন করে লড়াই শুরু করতে হয়েছিল তা অনেকেরই অজানা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম অন্যায় আধিপত্য যেমন জারি ছিল তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে করাচিবাসী বাঙালিদের নিরন্তর প্রতিবাদের ধারাও ছিল অব্যাহত। সেই সূত্রেই ১৯৬৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'করাচি ইউনিভার্সিটি ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্ট ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের নানা দাবি-দাওয়া আদায়ে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এবি এম সাখাওয়াত উল্লাহ, আবদুল্লাহ আল হাসান, হাসান ইমাম, মইদুল ইসলাম মুকুল, আবু ইসহাক, শরীফুল হক প্রমুখ এ বিষয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা ইতিপূর্বেই এবিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতির ভূমিকা উল্লেখ করেছি। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতির এই অধিকার আদায়ের লড়াই যে অবিরাম ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ৮ এপ্রিল, ১৯৬৬-র দৈনিক আজাদ পত্রিকার একটি সংবাদে। সেখানে বলা হয়েছিল—

> করাচীর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব এ বি এম সাখাওয়াত উল্লার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় শিক্ষা উজীর কাজী আনোয়ারুল হকের শহীদ সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি দাওয়া পেশ করেন। সমিতির এক প্রেস রিলিজে উপরোক্ত তথ্য জানা গিয়াছে।[৯]

পাকিস্তানবাসী বাঙালিদের এই অনবরত সংগ্রামের কারণেই কিন্তু করাচিতে ধীরে ধীরে বাংলা মাধ্যম স্কুল-কলেজ খোলা হয়। এমনকি করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগও খোলা হয়। সৈয়দ আলী আহসান ও মোস্তফা নুরুল ইসলাম বাংলা বিভাগ থেকে বেঙ্গলি লিটারারি রিভিউ নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তবে করাচি প্রবাসী বাঙালিদের এই সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদেরা খুব একটা সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তাদের সেই মনোভাবের কারণটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে তৎকালীন করাচিবাসী বাঙালি মোঃ শরীফুল হক লিখেছেন—

> পাকিস্তানি শাসনামলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সব রাজনীতিবিদদের ক্ষমতায় বসাতেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থান্বেষী। নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য তারা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের তোষামোদ ও তাঁবেদারীতেই ব্যস্ত থাকতেন। তাদের ভয় ছিল বাংলা ও বাঙালিদের পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে গেলে তারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পড়বেন।
> ফলে ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তারা নিজে বাঙালি হয়েও বাঙালিদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নীরবে সহ্য করতেন। প্রতিবাদের ভাষা তাদের মুখে ছিল না।[১০]

বাঙালি রাজনীতিবিদদের এই অপদার্থতাকে তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি এটাও জানাতে ভোলেননি যে এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা কিন্তু প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম থেকেই লড়ে গেছেন। এই কারণেই হয়ত পরবর্তীকালে পাকিস্তানবাসী বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে মুক্তিযুদ্ধের সময় সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টির উল্লেখ করে মোঃ শরীফুল হক আরও লিখেছেন—

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি জাতি যখন বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায় ও আত্মরক্ষার সংগ্রামে একাত্ম হয়ে পড়ে তখন পশ্চিম পাকিস্তানে অধ্যায়নরত বাঙালি ছাত্রসমাজ পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ঐ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিল আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের একচ্ছত্র আধিপত্য। তারা সেই সময়ে শুধু দলীয় নয়, গোটা বাঙালি জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। বাঙালি জাতির মুক্তির দাবিতে সংগ্রাম করেছিলেন। করাচির বাঙালি ছাত্র সমাজের সাথে তাঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে করাচির বাঙালি ছাত্র সমাজ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকতো এবং নিজস্ব কার্যক্রমকে একই ধারায় প্রবাহিত করতো। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ, ব্যবসায়ী মহল, চাকরিজীবী তথা আপামর জনসাধারণের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত পরিস্থিতি অবহিত করার ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে অধ্যয়নরত বাঙালি ছাত্র সমাজ এভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১১]

এঁদের হাত দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বঙ্গবন্ধুর হাতে পৌঁছেছিল। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও আধিপত্যের ভয়ঙ্কর স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারেন এবং বাঙালির প্রাণের দাবি নামা ছয় দফা প্রণয়ন করেন। সাখাওয়াত উল্লাহর মন্তব্যে এই দিকটি উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন—

... বাঙালি শিক্ষিত তরুণ-যুবকরা বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের উচ্চ-অবস্থানের আশপাশে জায়গা করে নিতে লাগলেন। ফলে তাদের কাছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি শোষণ চক্রান্তের নানা দলিলপত্র (ডকুমেন্ট) চলে আসতে লাগলো।... ... বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতা আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে, গোপন বৈঠক করে পশ্চিমাদের সব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতেন।... ... এসব প্রেক্ষাপটেই ষাটের দশকের মধ্যভাগে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাঙালির প্রাণের দাবি নামা ৬ দফা প্রণয়ন করেন।[১২]

নূর হোসাইন মোল্লা একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিভূমি

তৈরিই হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে বলা হয়েছে কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের অফিসারেরা দীর্ঘদিন গোপনে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে গোপন বৈঠক মারফত সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করতেন। পত্রিকার বিবৃতিটি এইরকম—

কর্মক্ষেত্রের বৈষম্য ও বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সরকারের নানা রকম নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর করাচিতে নৌবাহিনী জুনিয়র কতিপয় অফিসার ও সদস্যদের নিয়ে **১৯৬১** সালে একটি বিপ্লবী সংস্থা 'পূর্ব পাকিস্তান লিবারেশন ফোর্স' গঠন করেন পিরোজপুরের সন্তান, তৎকালীন পাকিস্তান নৌ বাহিনীর তৎকালীন তেজস্বী জুনিয়র অফিসার লে. মোয়াজ্জেম হোসেন।...শেখ মুজিবর রহমান (বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হননি তখনও) **১৯৬৪** সালের **১৫** থেকে **২১** সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করাচিতে অবস্থান করেন। ফেনী নিবাসী কামাল উদ্দিন আহমেদের বাসভবনে একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, লে. মোয়াজ্জেম হোসেন,...।[১৩]

এই বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে মোয়াজ্জেব হোসেন যে বিপ্লবী সংস্থা তৈরি করেছিলেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিরা, সামরিক-বেসামরিক অফিসারেরা নানাভাবে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে এখানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতির কথাও উল্লেখ করতে হয় কারণ এই সমিতির কার্যকলাপ শুধুমাত্র বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরও এই সমিতি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বার্থে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দলনে এই সমিতির ভূমিকা উল্লেখ করে মোহাম্মদ নূরুন নবী এফসিএ লিখেছেন—

এই ছাত্র সমিতিই করাচি তথা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবাসী বাঙালিদের এবং বাংলাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রামী করেছে এবং **১৯৭১**-এ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বৈরি পরিবেশেও সেখানে ক্ষেত্র তৈরির আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।[১৪]

এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিরা ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের শরিক হয়েছিলেন। আমরা বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালির রুখে দাঁড়ানো বলতে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদেরই বুঝি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদের নানাবিধ সংকট-সমস্যা এবং সেখান থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাঁদের নিরন্তর সংগ্রাম, সেইসঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের গোপন অংশগ্রহণ প্রায়শই সমালোচক-গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সেদিকেই আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা

করেছি। যেহেতু তাঁরা শত্রু ডেরাতেই ছিলেন তাই তারা প্রকাশ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে তাঁদের এই অংশগ্রহণ বেশি দিন গোপন থাকেনি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যত মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিরা শাসকের ডেরায় তত বেশি করে অত্যাচারের শিকার হচ্ছিলেন। তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল, বন্দী অবস্থায় গভীর অর্থ ও খাদ্য সংকটের মধ্যে তাঁদের প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনতে হচ্ছিল। বাঙালি অফিসারদের সামান্য সন্দেহেই গ্রাফতার করা হত এবং তাঁদের পরিবারকে নজর বন্দী করে রাখা হত। সাখাওয়াত উল্লাহর বিবরণীতে এরকমই একটি অস্বস্তিকর ভয়ংকর স্মৃতির কথা উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন—

> ষাটের দশকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হতে থাকায় পাকিস্তানি সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা কর্মীরা করাচিতে বসবাসরত বাঙালিদের সন্দেবসত অনেক রকম হয়রানি করতো। সার্জেন্ট জলিলের স্ত্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তিনি তাঁদের নাবালক দুই সন্তান নিয়ে গোয়েন্দা নজরদারির মাঝে ভয়ভীতির পরিবেশে বসবাস করতেন।[১৫]

মুক্তিযুদ্ধের পরেও বাঙালিদের পাকিস্তানে আটকে রাখা হয়েছিল। সমগ্র পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের আটক করে করাচিতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তারা যাতে বাংলাদেশে ফেরত যেতে না পারেন।[১৬] মোহাম্মদ নূরুন নবী এফসিএ করাচিতে বন্দী বাঙালিদের অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

> ১৯৭১-এর ষোলো ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের পরে পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সরকারি চাকুরিজীবীদের বেতন দুই তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা হয় এবং যেসব বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়, তাদেরকে কর্মস্থলে নিষিদ্ধ করা হয়।[১৭]

ভাবতে অবাক লাগে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা যখন স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছেন, বিজয় দিবসে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়াচ্ছেন সেই সময়েই কিছু বাঙালি তখনও মুক্তির জন্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন। এই লড়াইয়ে কেউ সফল হয়েছিল, কেউ হয়নি। কিছু বাঙালি গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়িয়ে দেশে ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন, আর যারা তা পারেননি তাদের দুরবস্থার প্রকৃত চিত্র কতটা ভয়ংকর তা হয়ত আমরা কখনোই সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হব না তথ্যের অভাবে বা প্রাণের ঝুঁকিতে। তবে বর্তমানে তাদের দুরবস্থার সামান্য কিছু নমুনা আমরা পূর্বে উল্লেখ

করেছি। ইতিহাসের প্রায় নিষিদ্ধ এই অধ্যায় নিয়ে গবেষণামূলক কাজ যেমন বিরল তেমনি সাহিত্যিকদের কলমও অনেকখানি নীরব। সেই জায়গা থেকে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী আবু ইসহাক। তিনি একটি দীর্ঘ সময় ধরে কর্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পরও সপরিবারে বন্দী ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক বাঙালির মতোই তিনিও নিজের পরিবার নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রবাস জীবনের নানা বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাই উঠে এসেছে তাঁর কিছু গল্পে ও স্মৃতিচারণমূলক রচনায়। পরবর্তী বর্গে আমরা আবু ইসহাকের লেখায় করাচিতে বাঙালির সংকট ও সংগ্রামের নানাদিক তুলে ধরার চেষ্টা করব।

তিন.

আবু ইসহাকের 'পিপাসা' (১৯৫৭), 'আলামত' (১৯৮৯), 'ঊনমূল্যায়ন' (১৯৯৭), 'গাড়ল' ইত্যাদি গল্প এবং 'মরণজয়ী এক সংগ্রাম', 'উদ্বেগ-উত্তেজনাময় সেই দিনগুলি' (১৯৭৮), 'দেওয়ালহীন কারাগারের সেই দিনগুলি' (১৯৯৮) নামক বেশ কিছু স্মৃতিচারণমূলক রচনায় পাকিস্তানবাসী বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভাষা-সংস্কৃতি-সামরিক আধিপত্য ও অত্যাচারের নানাদিক উঠে এসেছে।

বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরের বছরই লেখা হয় 'পিপাসা' গল্পটি। আসলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরেও পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিরা যে ভাষাগত কোনো স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেননি, তাঁদের উপর তখনও যে অন্যায় ও বে-আইনীভাবে ভাষাগত আধিপত্য বজায় ছিল সেই দিকটি স্পষ্ট ভাবে উঠে আসে। এখানে দেখা যায় জোহরা বেগম নামে একজন মহিলা স্বামীর কর্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানে থিতু হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে তিনি কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। কারণ সেখানে তার নিজের মাতৃভাষা বাংলার কোন স্থান ছিল না। তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি রেডিও। করাচিতে ঢাকা স্টেশন স্পষ্টভাবে আসে না। তাই তাঁকে নির্ভর করতে হয় রেডিও পাকিস্তান করাচির জন্য। সেখানে বাংলায় খবর সম্প্রচারিত হলে তিনি সেটি শোনেন শুধুমাত্র খবর শোনার জন্য নয়, গোগ্রাসে বাংলাভাষাকে গেলার জন্য। আর সেখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দেওয়া হয় একটি মাত্র বাংলা গান যার জন্য জোহরা বেগম সারাদিন রেডিও হাতে অপেক্ষা করেন। এই ঘটনার মধ্যেই কিন্তু লেখক দেখিয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানিদের বাঙালিদের ওপর ভাষার আধিপত্যের একটি দিক।

জোহরা বেগম আফসোস করে বলেন—

যে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বাংলাভাষী, সে দেশের রাজধানীর বেতার কেন্দ্র থেকে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টায় তিন মিনিটের একটি মাত্র বাংলা গান দেয়া হয়।[১৮]

বাংলা ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে প্রাণপণ সংগ্রাম করে ভাষার অধিকার আদায়ের পরেও করাচিবাসী গৃহবন্দী এক গৃহবধূর নিজের মাতৃভাষার জন্য এই তীব্র আকুতির মধ্যে দিয়েই আবু ইসহাক পাশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর আধিপত্যের মধ্যে থাকা আপামর বাঙালির দমবন্ধকর অবস্থাটিকেই যেন রূপদান করেছেন এই গল্পে। এর বিরুদ্ধে বাঙালির আমরণ সংগ্রামের কথাও উঠে এসেছে আবু ইসহাকেরই 'মরণজয়ী এক সংগ্রাম' নামক স্মৃতিচারণ মূলক লেখায়। এখানে আমরা জানতে পারি পাকিস্তানবাসী বাঙালিরা পাকিস্তানে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য, শিক্ষা মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার জন্য লাগাতার সংগ্রাম করে এসেছিলেন এবং খানিক সফল হয়েছিলেন। এই লেখাটিতে পাকিস্তানবাসী বাঙালিদের এই সংগ্রামকেই আবু ইসহাক মরণজয়ী সংগ্রাম বলেছেন। সেই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের জানিয়েছেন এইভাবে—

স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা-মাধ্যম স্কুল ও কলেজ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান না থাকায় বেশ ভোগান্তি হয় নিম্নবিত্ত সাধারণ বাঙালি শিক্ষার্থীদের। তা নিয়ে আমাদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়।... ... ... আমরা পুরো ষাট দশক জুড়ে করাচির পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতির পক্ষ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার বাংলা-মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইব্রেরীসহ সব শিক্ষা উপকরণ দ্বারা যথোপযুক্ত মানে উন্নীতকরণের এবং শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনের দাবি জানিয়ে সংগ্রাম করে আসছিলাম এবং অনেকাংশে সফলও হয়েছিলাম।[১৯]

শুধু ভাষার উপর আধিপত্য নয়, করাচি পৌঁছেই আবু ইসহাকের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে এক বিস্তর মানসিক দূরত্ব। সেখানকার সাধারণ মানুষও নানাভাবে বাঙালি মুসলমানদের হেনস্তা করতেন। সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেও বাঙালিদের অপমান করাটা কীভাবে তাদের দৈনন্দিন কর্মের অনিবার্য দিক হয়ে উঠেছিল তাও স্পষ্ট করেছেন 'গাড়ল' গল্পে। করাচিতে থাকাকালীন ইলিয়াস এক ফলওয়ালার কাছে আম কেনার সময় আমগুলিকে যখন কানের কাছে বাজিয়ে যাচাই করছিলেন তখন ফলওয়ালা তাঁকে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে অপমান করে বলে—

ইয়ে তো ঝুমঝুমি নেহি হ্যায় যো বাজেগা! ... ... ম্যায় শুনা হায় বাঙাল মুলুক কা আদমি বহত আকলমন্দ হোতা হায়। লেকিন তুম তো বুদ্দু হায়।[২০]

প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের শিশু-কিশোরদের মধ্যেও এই ঘৃণার বীজ এমন সুনিপুন ভাবে প্রবিষ্ট করে দেওয়া হত যে তারাও নানা খারাপ আচরণ করত পূর্ব

পাকিস্তানের বাঙালিদের সাথে। আবু ইসহাকের ‘আলামত’ (১৯৮৯) গল্পটি লেখার পেছনে রয়েছে লেখকের এমনই তিক্ত অভিজ্ঞতা। ‘আলামত’ গল্পের শুরুই হয়েছে এমন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে। গল্পে দেখা যায় ১৯৫৬ সালে ঢাকা থেকে বদলি হয়ে ইলিয়াস যখন করাচির রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন তখন তাঁরই মত অন্যান্য পথচারী বাঙালিরাও প্রায়ই শুনতে পেতেন—

পেছন থেকে বা কোনো বাড়ির বারান্দা থেকে কেউ বলছে ‘মাচ্ছি খানেওয়ালা বাঙালি যা রাহা হায়’ অথবা ‘ইয়ে বাঙালি বাবু, আপনা ওয়াতন ছোড়কে কিউ উধার আয়া? আপনা মুলুক ওয়াপস চলে যাও, অথবা ‘বাঙালি মাচ্ছি খাতা হায়, ইস লিয়ে ইয়ে লোগোকাঁ বদনছে বদবো নিকালতা হায়।’ কখনো পেছন দিকে বা এপাশে-ওপাশে তাকালে দেখা যেত, কথাগুলো যারা কথক তারা নেহাতই ছেলে-ছোকরা। বয়স তাদের আট থেকে পনেরোর মধ্যে। বাঙালিদের বিরুদ্ধে এমন বিদ্বেষ এত অল্প বয়সী ছেলেদের মধ্যে কীভাবে কেমন করে দানা বেঁধে উঠেছে, বুঝতে তখন অসুবিধে হয় নি। বড়দের থেকেই যে এ বিদ্বেষ ছোটদের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।[২১]

সাধারণ মানুষ থেকে শিশু-কিশোর প্রত্যেকের মধ্যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে এমন বিদ্বেষ, এমন ঘৃণা সত্যিই আমাদের অবাক করে। আসলে বোঝাই যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা একেবারে ছোটবেলা থেকেই এদের তৈরি করত বাঙালি বিদ্বেষী হিসেবে, যার বহিঃপ্রকাশ তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ঘটাত। যার ফল বাঙালি মুসলমানদের প্রতি পদক্ষেপে করাচিতে ভোগ করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আবু ইসহাক এই গল্পের প্রথমে তুলে ধরেছেন। এই মানসিক বিদ্বেষ ও ঘৃণাই তো অনিবার্য করে তুলেছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে। আবু ইসহাক তাঁর ‘আলামত’ গল্পে এই সত্যটিকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ক্ষেত্র সর্বত্রই এই বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হতে আবু ইসহাক বুঝেছিলেন পাকিস্তানের বিভাজন অনিবার্য। দুটো আলাদা জাতের সীম গাছের রূপকে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন ‘আলামত’ গল্পে। তিনি দেখিয়েছেন দুটো আলাদা জাতের সীম চারা একসঙ্গে রোপণ করার পরেও চারা দুটি বড় হয়ে নিজেদের মধ্যে দুরত্ব তৈরি করে নিয়েছে। এভাবেই তিনি পাঠককে বুঝিয়ে দেন দুই আলাদা ভূখণ্ডের, আলাদা ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে কখনও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়। কারণ তাঁদের শেকড়টাই আলাদা।

শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়, সরকারি অফিস-আদালতেও এই বিদ্বেষ-বৈষম্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তৈরি করে দিয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা।

এর শিকার হতে হয়েছিল পুলিশ বিভাগে কর্মরত ইলিয়াসকে। 'ঊনমূল্যায়ন' (১৯৯৭) গল্পে সেই বিষয়টি উঠে এসেছে। এই গল্পে দেখা যায় সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজে ট্রেনিং নেওয়ার সময় মেধার দিক থেকে ইলিয়াস ওপরের সারির ছাত্র হলেও তার ছোটখাটো চেহারার জন্য পশ্চিমা পাঠানরা তাকে সবসময় নানা ভাবে হেয় করত। আবার তাদের হর্স রাইডিং-এর ট্রেনিং দিতেন যে শিক্ষক তিনিও ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। ফলে তিনি সবসময় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের নানাভাবে অযোগ্য প্রমান করার চেষ্টা করতেন। সমস্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আবু ইসহাককেও কখনও পুলিশের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়নি কারণ তিনি বাঙালি। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতাই জীবনের শেষ প্রান্তে লেখা 'ঊনমূল্যায়ন' গল্পে উঠে এসেছে—

পঁয়ত্রিশ বছর পুলিশ বিভাগে চাকরি করে মোহাম্মদ ইলিয়াস অবসরগ্রহণ করেছেন। শুরু করেছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে, শেষ করেছেন সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে এগারো বছর চাকরি করার পর। এক সামরিক রাষ্ট্রপতির সময়ে বেশ কিছু সেনা অফিসারকে পুলিশ বিভাগে আমদানির না করলে তাঁর আরো একধাপ উপরের পদে পদোন্নতি লাভের খুবই সম্ভাবনা ছিল, কারণ গ্রেডেশন লিস্ট-এ তাঁর নাম ছিল সমসাময়িক অফিসারদের সবার উপরে।[২২]

পশ্চিম পাকিস্তানিদের পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর বিদ্বেষ নিছক জাতিগত বিদ্বেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতিগত বিদ্বেষ থেকেই এসেছিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং সেই ষড়যন্ত্রের শিকার আবু ইসহাক নিজেও হয়েছেন। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনাগুলিতে সেই বিষয়টি উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বাঙালি অফিসাররা পশ্চিম পাকিস্তানে থেকেও কীভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে ডিফেক্ট করতেন সেই অভিজ্ঞতাও তখন পশ্চিম পাকিস্তানে চাকুরিরত আবু ইসহাকের কলমে উঠে এসেছে। তিনি নিজেও এসব কাজের সহায়ক ছিলেন। 'উদ্বেগ-উত্তেজনাময় সেই দিনগুলি' (১৯৭৮) নামক স্মৃতিচারণমূলক রচনায় ইলিয়াসের মাধ্যমে উঠে এসেছে লেখকের সেই সব দিনের অভিজ্ঞতা। তিনি লিখেছেন—

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তার পোস্টিং-এর আদেশ হয়েছিল পাকিস্তানের কয়েকটি দূতাবাসে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তাঁর এক অধস্তন কর্মকর্তা তাঁকে ডিঙিয়ে তাঁর উপরস্থ কর্মকর্তার কাছে রিপোর্ট দিয়েছিল যে ওইসব বাঙালি কর্মকর্তা দূতাবাসে যাওয়ার সুযোগ পেলে বাংলাদেশের পক্ষে নির্ঘাত ডিফেক্ট করবে।... ... ইলিয়াস জানতেন যে ওইসব কর্মকর্তা দূতাবাসে যাওয়ার সুযোগ পেলে ডিফেক্ট করবেন। তিনিও মনে মনে তাই কামনা করছিলেন। কর্নেলকে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ওই কর্মকর্তারা 'ডিফেক্ট' করতেই পারেন না। তাঁর সুপারিশের উপর নির্ভর করে কর্নেল ওইসব

কর্মকর্তাদের দূতাবাসে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। দূতাবাসে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে ঐ সব বাঙালি কর্মকর্তারা যখন 'ডিফেক্ট' করেন তখন ইলিয়াস খুব খুশি হয়েছিলেন।[২৩]

ইলিয়াসের মতোই বহু বাঙালি পুলিশ অফিসার যারা বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন তাঁরা গোপনে বিভিন্নভাবে নিজেদের দেশকে সাহায্য করে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই। এভাবে বাঙালিরা ক্রমশ মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে থাকা বাঙালিরা আরও আটকে পড়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের কারাগারে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা জয়লাভ করার পর পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে থাকা প্রত্যেকটি বাঙালিকে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে আবু ইসহাকের 'উদ্বেগ উত্তেজনাময় সেই দিনগুলি', 'দেওয়ালহীন কারাগারের সেই দিনগুলি' নামক স্মৃতিচারণমূলক রচনায়। 'উদ্বেগ উত্তেজনাময় সেই দিনগুলি' রচনাটি নিয়ে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি কীভাবে ইলিয়াস ও তাঁরই মত বাঙালি পুলিশ অধিকর্তারা পূর্ব পাকিস্তানের পাশে থাকতেন। এই অপরাধে ইলিয়াসের সাজাও হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটির আদেশ দিয়ে তাঁর অফিসে আসা বন্ধ করা হয়েছিল। শুধু তাঁকে নয় পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত অফিসার ও চাকুরীজীবিদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিরা জয়লাভ করলেও এঁদের বন্দীদশা অব্যাহত ছিল। তাঁদের সেই দুর্বিষহ দিনগুলির অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে আবু ইসহাক 'উদ্বেগ উত্তেজনাময় সেই দিনগুলি'-তে লিখেছেন—

> পাকিস্তান সরকার তাঁদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে ভরণপোষণের জন্য মাইনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ প্রদান করার ব্যবস্থা করে পাকিস্তানে আটকে রাখে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সব পথ তাঁদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২৪]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং তার পরবর্তী বেশ কয়েক বছর ইলিয়াসসহ তার কিছু সহকর্মীকে এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই যেতে হয়েছে। একদিকে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের পাকিস্তানে বন্দী করে রেখেছিল অন্যদিকে পাকিস্তানের কিছু দুষ্কৃতি তাঁদের বন্দীদশাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল। 'দেওয়ালহীন কারাগারের সেই দিনগুলি' (১৯৯৮) নামক স্মৃতিচারণমূলক রচনায় উঠে এসেছে লেখকের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা—

> দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস চলে যায়। বাঙালিদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে কোনো কিছুই শোনা যাচ্ছে না। দেয়ালহীন কারাগারে তাঁদের বন্দীজীবন কাটে নিদারুণ উদ্বেগ

ও আশঙ্কায়। পাকিস্তানী দুর্বৃত্তরা বাঙালিদের অনেকের বাসার দেয়ালে রক্তমাখা ছোরা এঁকে রেখে যায়। রাস্তায় বাঙালিদের দেখলে গালাগাল দেয়, মেরে ফেলার হুমকি দেয়।[২৫]

এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য যখন ইলিয়াস দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি বুঝতে পারেন—

গোয়েন্দা সংস্থার ওয়াচারগণ তাঁর চলাফেরা ও কার্যকলাপের ওপর নজর রাখছে। ওয়াচারগণ অন্য উপবিভাগের হলেও একই অফিসের বলে অনেকেই তাঁর মুখচেনা। তিনি জানালা দিয়ে উঁকি মেরেও গোয়েন্দা সংস্থার কিছু পরিচিত মুখ বাসার সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে দেখেছেন।[২৬]

আবু ইসহাক তাঁর এই ধরণের রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে আসলে সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে থাকা বাঙালিদের করুণ অবস্থাটিকেই তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের মানুষেরা যখন মুক্তিযুদ্ধের পর সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার আনন্দ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছেন তখন কিন্তু সেই দেশেরই কিছু মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটকে দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে। স্বাধীনতা লাভের পরেও পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে থাকা বাঙালিদের এই যন্ত্রণার ইতিহাস লেখালেখিতে খুব একটা উঠে আসেনি। সেই অনালোকিত অধ্যায়টি আবু ইসহাকের কিছু লেখায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু শিল্প সার্থক গল্প লেখার অবকাশ থাকলেও শুধুমাত্র 'আলামত' ও 'পিপাসা' গল্পদুটিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়, বাকি রচনাগুলিকে ঠিক গল্পের মর্যাদা দেয়া চলে না। এগুলি তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তা সত্ত্বেও বিষয় গত অভিনবত্বের কারণে তাঁর রচনাগুলি নিয়ে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য। তবে সেই সাহিত্যগুলির বেশিভাগেরই প্রেক্ষাপট পূর্ব পাকিস্তান এবং বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার। তবে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে থাকা বাঙালিদের দুরবস্থার কোনো উল্লেখ আমরা পাই না। কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। যাঁদের সেই অভিজ্ঞতা ছিল তাঁরা কেউ কেউ এখনও দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছেন পশ্চিম পাকিস্তানেই, সেখানে এই বিষয়ে লেখার অর্থ মৃত্যুবরণ করা আর যাঁরা ফিরে আসতে পেরেছেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন ধর্মীয় fallacy-র মধ্যে। ফলে ইতিহাসের একটি অধ্যায় সাহিত্যে প্রায় ব্রাত্যই থেকে গেছে। সেদিক থেকে আবু ইসহাকের গল্পগুলিতে ইতিহাসের একটি অনালোকিত অধ্যায়কে উঠে

আসতে দেখি। তাই তাঁর এই লেখাগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পগত সার্থকতা না পেলেও বিষয়গত অভিনবত্বের কারণে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. https://www.bbc.com/bengali/news-42903719

২. শরীফ, আহমদ, 'ভাষা প্রসঙ্গে বিতর্কের অন্তরালে', *মহান একুশে,* মজহারুল ইসলাম, চিত্ত মণ্ডল, প্রথমা রায়মণ্ডল (সম্পাদিত), নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ২৬

৩. আয়াজ, বাবর, 'বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা', (অনুবাদ- প্রতীক বর্ধন), *একাত্তরের পূর্বাপর : করাচিতে বাঙালির সংগ্রাম,* সুকান্ত গুপ্ত অলক (সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃষ্ঠা. ৩১৫-৩১৭

৪. হক, মোঃ শরীফুল, 'করাচিতে আমরা এবং যেভাবে পাকিস্তানের পচন শুরু', *একাত্তরের পূর্বাপর : করাচিতে বাঙালির সংগ্রাম,* সুকান্ত গুপ্ত অলক (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৫

৫. ইসহাক, আবু, 'অম্লান স্মৃতি', *গল্প সমগ্র,* নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা. ২৮৯

৬. হক, মোঃ শরীফুল, 'করাচিতে আমরা এবং যেভাবে পাকিস্তানের পচন শুরু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৬-৪৭

৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

৮. নবী, মোহাম্মদ নূরুন, 'কিছু বাস্তব স্মৃতি ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি', *একাত্তরের পূর্বাপর : করাচিতে বাঙালির সংগ্রাম,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২

৯. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৮ এপ্রিল, ১৯৬৬

১০. হক, মোঃ শরীফুল, 'করাচিতে আমরা এবং যেভাবে পাকিস্তানের পচন শুরু', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৪

১১. ঐ, পৃষ্ঠা. ৪৪-৪৫

১২. উল্লাহ, সাখাওয়াত, 'করাচিতে যাদের পেয়েছি যাদের সঙ্গে ছিলাম', *একাত্তরের পূর্বাপর : করাচিতে বাঙালির সংগ্রাম,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৯

১৩.https://www.dhakatimes24.com/2017/03/25/25661/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A

6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87

১৪. নবী, মোহাম্মদ নূরুন, 'কিছু বাস্তব স্মৃতি ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৩

১৫. উল্লাহ, সাখাওয়াত, 'করাচিতে যাদের পেয়েছি যাদের সঙ্গে ছিলাম', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২০-২১

১৬. https://www.barishalprotibedon.com/country/55809

১৭. নবী, মোহাম্মদ নূরুন, 'কিছু বাস্তব স্মৃতি ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৫

১৮. ইসহাক, আবু, 'পিপাসা', *গল্প সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪০

১৯. ইসহাক, আবু, 'মরণজয়ী এক সংগ্রাম', *একাত্তরের পূর্বাপর : করাচিতে বাঙালির সংগ্রাম,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৬৫-৬৬

২০. ইসহাক, আবু, 'গাড়ল', *গল্প সমগ্র* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৭৪

২১. ইসহাক, আবু, 'আলামত', *গল্প সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২২১

২২. ইসহাক, আবু, 'ঊনমূল্যায়ন', *গল্প সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৭৪

২৩. ইসহাক, আবু, 'উদ্বেগ-উত্তেজনাময় সেই দিনগুলি', গল্প সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২২৬

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা. ২২৫

২৫. ইসহাক, আবু, 'দেয়ালহীন কারাগারের সেই দিনগুলি', *গল্প সমগ্র,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৩২

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা. ২৩৩